সন্ত্রাস তুমি কোথা হইতে...

অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়

অপরাধীর নিন্দা করার চেয়ে সহজ কাজ আর কিছু নেই, অপরাধীকে বোঝার চেয়ে কঠিন কাজ আর হয়না। ফিয়োদর দস্তয়েভস্কি

৯-১১'র কয়েক দিন পরে ২০০১ -এর ২০ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট বুশ মার্কিন কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে একটি ভাষণে প্রশ্ন তুলেছিলেন, কেন এই আক্রমণ? আল কায়দা কেন আমেরিকাকে শত্রু মনে করে? তিনি এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন, সেটি এখন আমাদের মুখস্ত হয়ে গেছে। তবু তার মূল কথাগুলো স্মরণ করা ভাল, কারণ এটিই মার্কিন প্রশাসন এবং তার উপদেষ্টাদের ধারণা, এই ভাবেই তাঁরা সন্ত্রাসের কারবারিদের বোঝেন, সন্ত্রাসবাদীর মানসকিতা বোঝেন। বুশ বলেছিলেন, ''ওরা বিশ শতাব্দীর যাবতীয় খুনে আদর্শের উত্তরাধিকার বহন করছে। নিজেদের চরমপন্থী লক্ষ্য পূরণের জন্য ওরা মানুষের জীবন বলি দিয়ে চলেছে, ক্ষমতার লালসায় সমস্ত আদর্শ বা মূল্যবোধকে ওরা জলাঞ্জলি দিয়েছে, ওরা ফ্যাসিবাদ, নাৎসিবাদ এবং সমগ্রাসী শাসনের (টোটালিটারিয়ানিজম) পথে চলেছে,'' অর্থাৎ, গণতন্ত্রের মহান আদর্শ, আমেরিকা যার প্রধান ধ্বজাধারী, সন্ত্রাসবাদীরা তাকেই পর্যুদস্ত করতে চায়। সেই কারণেই ওরা ামেরিকাকে শত্রু মনে করে, অতএব আক্রমণ, অতএব ৯-১১। প্রেসিডেন্ট বুশ বলেছিলেন ঃ ''আমরা এত ভাল, তা সত্ত্বেও ওরা আমাদের ঘৃণা করে কেন?'' নিজস্ব মস্তিষ্কপ্রসূত এই প্রশ্নের যে উত্তর ওঁরা দিয়েছেন, সেটিও নিজেদেরই মগজ থেকে এসেছে। উত্তরটা এই যে, আমরা এত ভাল বলেই ওরা আমাদের ঘৃণা করে, আমাদের গণতান্ত্রিকতা উদারতা ওদের কট্টর ফ্যাসিবাদের শত্রু, তাই ঘৃণা অনিবার্য।

এই ধারণা সন্ত্রাসবাদীদের শয়তান হিসেবেই দেখে, আর কোনও ভাবে দেখে না, দেখতে রাজি নয়। আর তাই, এই ধারণা অনুসারে, সন্ত্রাসের মোকাবিলা করার একমাত্র পথ হল সন্ত্রাসবাদীদের প্রচণ্ড আক্রমণে চূর্ণবিচূর্ণ করা, সে জন্য যদি বহু নিরপরাধ মানুষের সর্বনাশ হয়, যদি একটা দেশের বহু সম্পদ বিনষ্ট হয়, সেই ক্ষয়ক্ষতিকে 'কোল্যাটেরাল ড্যামেজ' বলে মেনে নিতে হবে, কারণ এ ছাড়া সন্ত্রাস দমনের অন্য কোনও পথ নেই। সন্ত্রাসের মোকাবিলায় মার্কিন নেতৃত্বে যে অভিযান গত কয়েক বছর ধরে চলছে, ভারতও উত্তরোত্তর যার উৎসাহী শরিক হয়ে উঠছে, তার ভিতরে নিহিত আছে এই দৃষ্টিভঙ্গি। এবং শুধু ওই অভিযানের ক্ষেত্রে হয়, সামগ্রিক ভাবেই এই দৃষ্টিভঙ্গি সন্ত্রাস সম্পর্কে সন্ত্রাসবাদের সমস্যাকে অন্য কোনও ভাবে দেখতে চাইলে সেই দেখাটাকে অস্বাভাবিক, ব্যতিক্রমী, এমনকী অন্যায় বলে বিবেচনা করা হয়। অথচ, অন্যভাবে দেখতে চাইলে হয়তো সন্ত্রাসের মোকাবিলা করার অন্য পথও খুঁজে পাওয়া যেত। সন্ত্রাস সম্পর্কিত আলোচনায় তাই ওই প্রশ্নটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; সন্ত্রাসবাদীদের আমরা কী ভাবে দেখব?

লিজ রিচার্ডসন এই প্রশ্নটাই তুলেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের র‍্যাডক্লিফ ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্সড স্টাডি'র ডিন, লিজ রিচার্ডসন দীর্ঘ দিন সন্ত্রাস এবং সন্ত্রাসবাদীদের নিয়ে গবেষণা করছেন। লিজ আয়ার্ল্যাণ্ডের মানুষ, সেখানেই বড় হয়েছেন, সেই বড় হওয়ার সময়টা আয়ার্ল্যাণ্ডের 'স্বাধীনতা আন্দোলন' -এর বহু সৈনিক এবং সমর্থকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে কাটিয়েছেন তিনি। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁর মনে সন্ত্রাসবাদীদের বোঝার তাগিদ জন্ম নিয়েছে। 'হোয়াট টেররিস্টস ওয়ান্ট' নামে তাঁর একটি বই ২০০৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে। সেই বইয়ের ছত্রে ছত্রে তাঁর ওই তাগিদটি খুব স্পষ্ট। তিনি বুঝতে চেয়েছেন, সন্ত্রাসবাদীরা কেন সন্ত্রাসবাদী। তিনি দেখিয়েছেন, এই জিজ্ঞাসা না থাকলে সন্ত্রাস দমনের অনেক সম্ভাব্য পথ কী ভাবে চিন্তার বাইরে থেকে যায়। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। কয়েক বছর আগের কথা। তখনও ৯/১১ ঘটেনি। একটি আলোচনাসভায় বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন মাইকেল শিহান, ১৯৯৮ থেকে ২০০১ -এই সময়টায় শিহান ছিলেন মার্কিন বিদেশ মন্ত্রকের সন্ত্রাস দমন বিভাগের সমন্বয়সাধক (কোঅর্ডিনেটর ফর কাউন্টারটেররিজম)। সভায় এক ছাত্র সেই প্রশ্নটি তুললেন, যা প্রেসিডেন্ট বুশ কিছু দিন পরে উচ্চারণ করবেন, 'ওরা আমাদের ঘৃণা করে কেন?' স্পষ্টতই এ-প্রশ্ন অনেক দিন ধরেই মার্কিন নাগরিকের মনে ঘোরাফেরা করছে। তো, ওই ছাত্রের প্রশ্নের জবাবে শিহান জানিয়েছিলেন, ওরা আমাদের ঘৃণা করে কারণ আমরা স্বাধীনতা ভালবাসি, গণতন্ত্র ভালবাসি। চেনা প্রশ্নের চেনা উত্তর, ৯-১১ -র পরে জর্জ বুশ এবং তাঁর সহকর্মী ও সহমর্মীদের মুখে আমরা বহুবার শুনেছি।

লিজ ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি শিহানের জবাব শুনে একটা পাল্টা প্রশ্ন ছুড়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ''ধরুন যদি আমরা জানতে পারতাম যে আমরা যে নীতি অনুসরণ করেছি সে জন্যই ওরা আমাদের ঘৃণা করে? যেমন ধরুন, যদি জানতাম যে, সৌদি আরবে আমাদের সেনা মোতায়েন করা হয়েছে বলেই ওরা আমাদের শত্রু মনে করে? তা হলে কি আপনারা আপনাদের নীতি সংশোধন করতে সম্মত হবেন?'' শিহান খুব জোর দিয়ে বলেন, না। ''আমরা কী নীতি অনুসরণ করব, সেটা সন্ত্রাসবাদীরা ঠিক করে দেবে, এটা কখনও হতে দেব না।'' এমন চতুর এবং দাপুটে উত্তর শুনে স্বভাবতই সভাস্থলে প্রচুর করতালি শোনা গেল।

লিজ লিখছেন, ''শিহান সে দিন তার্কে জিতে গেলেন, কিন্তু তাঁর জবাব শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। আজও ভাবলে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই, ওঁরা কতটা অদূরদর্শী!'' লিজ-এর বক্তব্য, সৌদি আরবের নিরাপত্তা বিধানের জন্য সেই দেশের মাটিতে মার্কিন সেনা মোতায়েন করা ছাড়াও অনেক উপায় ছিল। যেমন, পারস্য উপসাগরে আর একটি মার্কিন বিমানবাহী রণতরী মোতায়েন করা যেত। কিন্তু ক্ষমতার অহঙ্কার এমনই যে সেই সব বিকল্প নিয়ে মার্কিন কর্তরা যথেষ্ট চিন্তাভাবনাই করেননি, 'আমরা যা ভাল মনে করি তা-ই করব', এই মন্ত্র ছাড়েননি। সেটা যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বহু মানুষকে খেপিয়ে তুলবে, এই আশঙ্কাকে তাঁরা লঘু করে দেখেছেন, কিংবা আদৌ দেখেননি। এই গোঁয়ার্তুমির পরিণাম শুভ হয়নি। মনে রাখা দরকার সৌদি আরবে মার্কিন সেনা মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত আল কায়দার সন্ত্রাসের একটা বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ওসামা বিন লাদেন এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেন এবং সেই বিরোধিতাকে নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারে বিশেষভাবে কাজে লাগান। তিনি ক্রমাগত প্রচার করে চলেন যে সৌদি আরবের মাটিতে মার্কিন সেনার উপস্থিতি অত্যন্ত অপমানজনক এবং এর থেকেই প্রমাণ হয় যে সৌদি আরবের তেল - ভাণ্ডার ও তার স্বাধীনতা, বস্তুত, বিশ্বাস করার বিলক্ষণ যুক্তি ছিল এবং আছে। এই বাস্তব স্বীকার করে নিয়ে নিজেদের নীতি সংশোধন করলে ওয়াশিংটনের কর্তারা হয়তো সন্ত্রাস মোকাবিলার একটা অন্য পথ খুঁজে পেতেন। কিন্তু তাঁরা অন্য পথ খোঁজেননি।

তাঁরা যে পথ খুঁজেছেন, সেটা মারের পথ। সেই পথের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, যত সন্ত্রাসবাদী মার খায় বা মারা পড়ে, তার চেয়ে বেশি সন্ত্রাসবাদী তৈরি হয়। ঠিক এটাই টের পেয়েছিলেন মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামস্‌ফেল্ড। ২০০৩ সালের ১৬ অক্টোবর রামসফেল্ড তাঁর দফতরের চার জন অফিসারকে একটি 'মেমো' পাঠিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, ''আমরা সন্ত্রাসের

বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অভিযানে জিতছি না হারছি, সেটা বিচার করার মাপকাঠি আমাদের হাতে নেই। আমরা প্রতি দিন যত সন্ত্রাসবাদীকে ধরছি , মারছি অথবা তাদের কাজে বাধা দিচ্ছি কিংবা নিবৃত্ত করছি, মাদ্রাসাগুলি এবং মৌলবাদী প্রচারকরা তার চেয়ে বেশি সংখ্যায় সন্ত্রাসবাদীকে নিয়োগ করছে না, প্রশিক্ষণ দিচ্ছে না বা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মোতায়েন করছে না, এমনটা কি আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি?" রামস্‌ফেল্ড বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্টের বাবা জর্জ বুশ সিনিয়র - এর জমানাতেও প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি রিপাবলিকান মহলেও অতিমাত্রায় কট্টরপন্থী বলে পরিচিত। সন্ত্রাসবাদীদের কঠোরভাবে দমন করাই তাঁর চিরকালের নীতি। কিন্তু অভিজ্ঞতা বড় নির্মম শিক্ষক, এ-হেন জঙ্গি রামস্‌ফেল্ডও টের পেয়েছিলেন, তাঁরা রক্তবীজের বিরুদ্ধে লড়ছেন। কিন্তু তার পরেও তিনি একটি মৌলিক সত্য বুঝতে পারেননি অথবা, বুঝলেও, স্বীকার করেননি। সত্যটি এই যে, সন্ত্রাস দমনের যে পথ তাঁরা বেছে নিয়েছেন, তাতে তাঁরা যত বেশি জিতবেন, তত বেশি হারবেন। কারণ, যাকে তাঁরা জয় বলে মনে করছেন, তার প্রতিক্রিয়ায় আরও অনেক সন্ত্রাস - আকাঙ্ক্ষা আরও বেশি জোরদার হবে।

ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে এই সত্যটি তাঁরা অনেক আগেই বুঝতে পারতেন। ইতিহাস এমন অনেক শিক্ষার সুযোগ দিয়েছে। এখানে একটি দৃষ্টান্ত নিয়ে একটু বিশদ ভাবে আলোচনা করা যাক। দৃষ্টান্তটি আয়ার্ল্যাণ্ডের। আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বশাসনের আন্দোলনের একটি দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাসের পাতা থেকে একটি ঘটনার উল্লেখ করি। ১৯৮৬ সালে লণ্ডন শহরে ক্লার্কেনওয়েল কারাগারে একটি বিস্ফোরণে দুটি শিশু সহ ছ'জনের মৃত্যু হয়, শতাধিক মানুষ আহত হন। আয়ার্ল্যাণ্ডের ব্রিটিশ শাসনের বিরোধী 'ফেনিয়ান'দের এই সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছিল ইংল্যাণ্ডে, বিশেষত লণ্ডনে। প্রসঙ্গত, আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধিকারের প্রবল সমর্থক কার্ল মার্ক্স এই ঘটনার নিন্দা করে এঙ্গেলসকে লিখেছিলেন, ''ক্লার্কেনওয়েলে ফেনিয়ারদের সাম্প্রতিক কীর্তিটি ঘোর নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। লন্ডনের যে সাধারণ মানুষ আয়াল্যাণ্ডের প্রতি গভীর সহমর্মিতা দেখিয়েছেন, তাঁরা এই ঘটনায় ক্ষেপে উঠবেন এবং শাসক দলের দিকে চলে যাবেন।" বাস্তবে ঠিক তা-ই হয়েছিল। ইংল্যাণ্ডের সমাজ এবং ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী, উভয়েই এই আক্রমণের বদলা নিতে অতিমাত্রায় ব্যগ্র হয়ে পড়ে। এই সন্ত্রাসে জড়িত থাকার অভিযোগে বিস্তর লোককে গ্রেফতার করা হয়। সাধারণভাবে আইরিশদের বিরুদ্ধে জনমত প্রবল রোষে ফেটে পড়ে। গুজবের বন্যা বয়ে যায়। চর্তুদিকে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আর সেই আতঙ্কের পরিবেশে প্রতিহিংসার দাবি জোরদার হয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বিচারে এক জন মাত্র দোষী সাব্যস্ত হন, তাঁর নাম মাইকেল ব্যারেট। তাঁকে জনসমক্ষে, হাজার দুয়েক লোকের সামনে, ফাঁসি দেওয়া হয়। ইংল্যাণ্ডে সেটাই জনসমক্ষে শেষ ফাঁসি।

ব্যারেট সত্যিই দোষী কি না, তা নিয়ে বিলক্ষণ সংশয় ছিল, একাধিক সাক্ষী বলেছিলেন তিনি বিস্ফোরণের সময় অন্যত্র ছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত এক জনকে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো রাষ্ট্রের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে। ইংল্যাণ্ডের রানি স্বয়ং তাঁর সরকারের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে পত্রাঘাত করেন; ''এক জন ছাড়া ক্ল্যার্কেনওয়েলের অপরাধীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করতে পারা গেল না... ওই লোকগুলো রেহাই পেয়ে গেল, এটা ভয়ঙ্কর... মনে হয় ওই ফেনিয়ানগুলোকে তখনই ধরে ফেলে গণপ্রহারে শেষ করে দেওয়া উচিত ছিল।" গণপ্রহারের পক্ষে ইংল্যাণ্ডেশ্বরীর এক ভয়ানক সওয়াল শুনে অবাক হওয়ার কিছু নেই, রানি তাঁর প্রজাদের একটা বড় অংশের মনের কথাই বলেছিলেন, ব্যারেটের মা তাঁদের স্থানীয় এম পি'র কাছে গিয়ে সন্তানের প্রাণ ভিক্ষা করেছিলেন। জবাবে এম পি তাঁকে বলেন, শুধু তাঁর ছেলে নয়, সমস্ত ফেনিয়ানকে ফাঁসিতে ঝোলানো দরকার, এবং অবিলম্বে। জনমত কোন দিকে ছিল, বুঝতে অসুবিধে হয় না। সংবাদপত্রেও সেই একই উন্মাদনা—সমস্ত ফেনিয়ানের শাস্তি চাই। শাস্তি মানে, অবশ্যই মৃত্যু।

অন্য স্বরও একেবারে শোনা যায়নি, এমন নয়। জন স্টুয়ার্ট মিল হাউস অব কমনস -এর সদস্য হিসেবে ব্যারেটের মৃত্যুদণ্ড মকুব করার জন্য রানির কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। স্পষ্টতই, রানির সঙ্গে তাঁর মানসিক দূরত্ব ছিল বিস্তর। আর এক জন রাজনীতিক খুব চেষ্টা করেছিলেন স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দরকারি কিছু কথা বলতে। তিনি উইলিয়াম গ্ল্যাডস্টোন, তখন তিনি লিবারাল পার্টির এক জন এম. পি। তাঁর মতে, আয়ার্ল্যাণ্ডের মানুষের ক্ষোভ থেকেই আইরিশ হিংসার জন্ম, সেই ক্ষোভ দূর করাই ব্রিটিশ সরকারের কাজ, ব্রিটিশ সমাজেরও কাজ। তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন, নাগরিকরা যদি উন্মাদনার শিকার হয়, তার প্রভাব পড়বে জুরিদের ওপর, এমনকী বিচারকদের ওপর। কিন্তু এ-সব কথা শোনার ইচ্ছে সে দিন খুব বেশি মানুষের ছিল না। পরে প্রধানমন্ত্রী হয়ে গ্ল্যাডস্টোন আয়ার্ল্যাণ্ডের মানুষের ক্ষোভ দূর করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন, সফল হননি। আয়ার্ল্যাণ্ডকে 'হোম রুল' -এর মাধ্যমে সীমিত স্বাধিকার দেওয়ার প্রস্তাবেও ইংল্যাণ্ডের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমতের আপত্তি ছিল। জনমত অন্য রকম হলে, গ্ল্যাডস্টোনের কথা সমাজ শুনলে একশো বছর ইতিহাস হয়তো অন্য রকম হত। শেষ পর্যন্ত আয়ার্ল্যাণ্ডে শান্তি এসেছে, কিন্তু অনেক অশান্তি আর রক্তের বিনিময়ে।

ব্যারেটের মৃত্যুর প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে ১৯১৫ সালে আর এক ফেনিয়ান, জেরেমিয়া ও'ডোনোভাস রোসা-র অন্ত্যেষ্টির সময় এক তরুণ সমবেত শোকার্ত মানুষদের উদ্দেশে একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। আইরিশ জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে সে এক অবিস্মরণীয় ভাষণ। সেই বক্তৃতার কয়েকটি কথা ছিল এই রকম ''মৃত্যু থেকে জীবন উঠে আসে, দেশপ্রেমিক পুরুষ ও নারীর কবর থেকে উঠে আসে জীবন্ত জাতি।... নির্বোধ, নির্বোধ দল। ওরা আমাদের ফেনিয়ানদের হত্যা করছে। যত দিন এই কবরগুলি থাকবে, পরাধীন আয়ার্ল্যাণ্ড কখনও শান্তি পাবে না।" এর প্রায় ষাট বছর পরে ১৯৭৩ সালে ফেনিয়ানদের পরের প্রজন্ম, তত দিনে তাদের নাম হয়েছে আইরিশ রিপরাবলিকান আর্মি (আই আর এ), একটি শক্তিশালী বোমা রেখে গিয়েছিল লমডন 'ওল্ড বেলি' (ইংল্যাণ্ডের মুখ্য ফৌজদারি আদালত) এর সামনে, ঠিক যেখানে এক শতাব্দী আগে মাইকেল ব্যারেটের ফাঁসি হয়েছিল। মৃতের কবর থেকে অশান্ত বিদ্রোহীর জন্ম হয়।

ব্রিটিশ সরকার বিদ্রোহী আইরিশদের সন্ত্রাসের মোকাবিলায় ক্রমশ নিজেদের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েছে, প্রাণের বদলে প্রাণ, মারের বদলে মার - এর পুরনো নীতি ছেড়ে আই এ'র প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় আয়ার্লাণ্ডের মানুষের স্বাধিকারের দাবি অনুধাবন করে সে দাবি পূরণের দিকে এগিয়ে গেছে, গ্ল্যাডস্টোনের শিক্ষা, দেরিতে হলেও গ্রহণ করেছে। আয়ার্ল্যাণ্ডে সমস্যার সমাধানে এই শিক্ষা গ্রহণ এবং আত্মসংশোধনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

শিক্ষা নেওয়া মানে এই নয় যে সন্ত্রাসের সামনে নতজানু হতে হবে, সন্ত্রাসের প্রবক্তাদের সব দাবি মেনে নিতে হবে, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের প্রতিরোধ করা চলবে না, সেই কার্যকলাপের জন্য যারা দায়ী তাদের বিচার করা বা শাস্তি দেওয়া চলবে না। কখনওই তা নয়। শিক্ষা নেওয়া মানে এই যে, সন্ত্রাসের জবাবে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে প্রতিহিংসার পথে ঝাঁপিয়ে পড়লে চলবে না, অতি বড় বিপর্যয়ের সামনে দাঁড়িয়ে মাথা ঠাণ্ডা রেখে সমস্যার শিকড়ে পৌঁছানোর চেষ্টা করতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসের মোকাবেলায় এই কাজটাই করেনি। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রতিহিংসাই হয়ে দাঁড়িয়েছে তার প্রধান চালিকাশক্তি। এর ফলে সন্ত্রাস উত্তরোত্তর ব্যাপক এবং গভীর হয়েছে। রামসফেল্ডারা বিভ্রান্ত এবং বিস্মিত হয়ে মাথা চুলকেছেন, জিতছেন না হারছেন সেটাই তাঁরা বুঝতে অপারগ।

লক্ষণীয়, সন্ত্রাসের মোকাবিলা আধুনিক ইউরোপের আচরণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে অনেকটাই আলাদা। ২০০৫-এর ৭ জুলাই লণ্ডনের সাবওয়েতে সন্ত্রাসবাদীদের ভয়াবহ আক্রমণের পরে ইংলণ্ডের প্রশাসন সন্ত্রাসের মোকাবিলায় প্রবল ভাবে তৎপর হয়েছিল,

কিন্তু ৯/১১ -উত্তর মার্কিন প্রতিহিংসার ভাষায় কখনও কথা বলেনি। অর্থাৎ, সন্ত্রাসের সঙ্গে কী ভাবে লড়ব, কোন ভাষায় তার সম্পর্কে কথা বলব, সেটা সমকালীন দুনিয়াতেও অদ্বিতীয় কোনও ছকে বাঁধা নয়। প্রতিহিংসা এবং প্রতিশোধের মানসিকতা গ্রহণ না করলেই সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি নরম হলাম — এটা যে সত্য নয়, আমেরিকার নিকটতম ইউরোপীয় সঙ্গী ব্রিটেনের আচরণেই তার প্রমাণ মেলে। সম্ভব ত, বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক সন্ত্রাসের মোকাবিলায় ইউরোপের দীর্ঘ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা তার রাষ্ট্রচালকদের এই কাণ্ডজ্ঞানের শিক্ষা দিয়েছে। বরাবর অবশিষ্ট পৃথিবী থেকে 'শারীরিকভাবে বিচ্ছিন্ন' এবং 'মানসিকভাবে একাকী' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতিকারদের সেই শিক্ষার বিশেষ সুযোগ হয়নি, তাই আজ নয়া - সন্ত্রাসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁরা এতটা বেসামাল, এতটা 'অবুঝ'।

আমেরিকার সাধারণ মানুষ কিন্তু জানতে চান, বুঝতে চান। ৯-১১'র পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে কোরানের বিক্রি বিস্তর বেড়ে গিয়েছিল, সাধারণভাবে সম্পর্কিত বইয়ের চাহিদায় জোয়ার এসেছিল। বিন লাদেন নিজে এই ব্যাপারটা লক্ষ করে বন্ধুদের বলেছিলেন, তিনি শুনেছেন যে, আমেরিকায় ইসলাম বিষয়ক বইপত্রের চাহিদা এত বেড়ে গেছে যে বিক্রেতারা জোগান দিয়ে উঠতে পারছেন না। এর মানে একটাই। আমেরিকার মানুষ ইসলাম সম্পর্কে জানতে চাইছিলেন। স্পষ্টতই, এই জিজ্ঞাসার পিছনে একটা আতঙ্ক কাজ করেছিল। মনে রাখতে হবে, সাধারণভাবে মার্কিন সমাজে বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে কৌতূহল বেশ কম। আর, আমেরিকায় মুসলমানের সংখ্যা যাই হোক না কেন, ইসলাম মার্কিন সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের কাছে 'বাইরের ব্যাপার'। (এটা আমরা, ভারতের সংখ্যাগুরু সমাজের সদস্যরা ভালই বুঝব, আমরাও তো কুড়ি কোটি ভারতীয় মুসলমানকে 'বাইরের লোক' করেই রেখেছি।) সুতরাং, সাধারণ অবস্থায় মার্কিন নাগরিকদের ইসলাম - জিজ্ঞাসা প্রবল না হওয়াই স্বাভাবিক। সন্দেহ নেই, ৯-১১'র আতঙ্কই তাঁদের সেই জিজ্ঞাসাকে উৎসাহিতক করেছিল। এবং সেটাই আমাদের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ প্রশ্নটা হল, সন্ত্রাসের অভিঘাতে আতঙ্কিত এবং দ্বিগ্ন মানুষের প্রতিক্রিয়া কী হবে? আমেরিকার এই অভিজ্ঞতা জানিয়ে দেয় যে, অত্যন্ত নাগরিকদের একটি অংশ সেই আতঙ্ক এবং উদ্বেগের মুখোমুখি হয়ে মারের বদলে মার - এর ভাবেননি, বরং 'ওদের' বুঝতে চেয়েছেন।

কিন্তু যাঁরা রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের অংশীদার, তাঁরা এই সুস্থ, বিচক্ষণ এবং সম্ভাবনাময় জিজ্ঞাসার কোনও মর্যাদা দেননি। যেমন, মার্কিন প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য কার্ল রোভ নিউ ইয়র্ক কনজার্ভেটিভ পার্টির এক সভায় মন্তব্য করেছিলেন, ''৯-১১'র ঘটনা দেখে রক্ষণশীলরা (কনজার্ভেটিভ, যাঁরা শাসক রিপাবলিকানদের সহমর্মী) বললেন, 'আমরা শত্রুদের হারাব', আর উদারপন্থীরা (লিবারাল, বিরোধী ডেমোক্র্যাটদের সমর্থক' বললেন, ''আমরা শত্রুদের বুঝব।'' এই মন্তব্যে তীব্র ব্যঙ্গের সুরটি স্পষ্ট। অথচ এই ধারণার গোড়ায় গলদ। প্রতিপক্ষকে বোঝা মানে তাকে সমর্থন করা বা তার প্রতি সহানুভূতি পোষণ করা নয়। বরং, সন্ত্রাসবাদী হিংসার মূলে কী আছে, কোন অনুভূতি থেকে এই হিংসার উদ্ভব হয়, সেটা বুঝতে পারলে সন্ত্রাসের মোকাবিলায় অনেক বেশি সমর্থ হয়ে ওঠা যয়। এটা আসলে খুব সহজ কথা। যে কোনও সমস্যার সমাধান করতে গেলে আমরা প্রথমে সমস্যাটা বোঝার চেষ্টা করি। সন্ত্রাসবাদ একটা সমস্যা। যাঁরা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই করেন তাঁরাও নিশ্চয়ই সেটা মনে করেন। সুতরাং সন্ত্রাসবাদীদের বোঝা দরকার। কিন্তু নাগরিকরা তাঁদের স্বাভাবিক কাণ্ডজ্ঞান দিয়ে যা বোঝেন, তালেবর উপদেষ্টারা তা বোঝেন না।

সন্ত্রাসবাদীদের মানসিকতা বোঝার জন্য একটি ব্যাপার গভীরভাবে বুঝে নেওয়া জরুরি। সেটা হল, তাঁরা নিজেদের কী ভাবে দেখেন? তাঁদের ধারণায় তাঁরা হলেন অন্যায়ের প্রতিবাদী এবং প্রতিরোধী শক্তি। প্রবলের অন্যায়ের বিরুদ্ধে দুর্বলকে রক্ষা করতে চান তাঁরা, তাঁদের আঘাত, যাকে সন্ত্রাস বলা হচ্ছে, তা আসলে আত্মরক্ষার্থে, ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ, তাঁরা মনে করেন, তাঁরা অন্যের আগ্রাসনের জবাব দিচ্ছেন মাত্র। এবং তাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁদের প্রত্যাঘাত ভবিষ্যৎ আগ্রাসন বন্ধ করবে। যে প্রবল এবং অন্যায়কারী তাকে প্রচণ্ড আঘাত করলে সে ভয় পাবে, সমঝে যাবে, ভবিষ্যতে অন্যায় থেকে বিরত হবে, ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে বিস্তর বা সংযত হবে। আত্মপক্ষ সমর্থনে সন্ত্রাসবাদীদের এই যুক্তির একটি স্মরণীয় উদাহরণ মেলে স্বয়ং ওসামা বিন লাদেনের একটি বিবৃতিতে। ২০০৪ -এর ৩০ অক্টোবর 'মেসেজ টু অ্যামেরিকা' নামে প্রচারিত সেই বিবৃতিতে তিনি বলেছিলেন, ''আল্লা জানেন, (ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের) টাওয়ারের হানা দেওয়ার কথা আমরা আগে কখনও ভাবিনি, কিন্তু প্যালেস্তাইন এবং লেবাননে আমাদের লোকদের ওপর আমেরিকা ইজরায়েল জোটের আক্রমণ এবং অত্যাচার যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন এই (প্রত্যাঘাতের) ধারণা আমার মাথায় আসে। ১৯৮২ সালে এবং তার পরে যা ঘটেছিল তা আমাকে খুব নাড়া দেয়। আমেরিকা ইজরায়েলকে লেবানন আক্রমণ করতে দিল, নিজের নৌবাহিনী দিয়ে সাহায্য করল। ওরা বোমাবর্ষণ শুরু করল, বহু মানুষ হতাহত হলেন, বহু মানুষ প্রাণভয়ে পালাতে লাগলেন।... সে এক ভয়াবহ দৃশ্য, যেন একটা কুমির একটি শিশুকে গ্রাস করছে...কুমির কি অস্ত্র ছাড়া আর কোনও ভাষা বোঝে? গোটা পৃথিবী দেখল কী হচ্ছে, কিন্তু কিছুউ করল না। সেই কঠিন সময়ে আমার মাথায় অনেক চিন্তা তোলপাড় করছিল, সে সব চিন্তাকে বর্ণনা করা কঠিন, কিন্তু তারা আমার মধ্যে এক সুতীব্র তাগিদ সৃষ্টি করল—অন্যায়কে প্রত্যাখ্যান করার তাগিদ। আমি সঙ্কল্প করলাম, অত্যাচারীদের শাস্তি দিতে হবে। লেবাননে আমেরিকা - ইজরায়েলের আক্রমেণে বিধ্বস্ত টাওয়ারগুলিকে দেখে আমার মাথায় একটা চিন্তা এল, আমি ভাবলাম— আমেরিকায় সুউচ্চ কিছু টাওয়ার ধ্বংস করে অত্যাচারীদের শাস্তি দেওয়া যায়, যাতে ওরা নিজেদের দাওয়াইয়ের একটা স্বাদ পায় এবং আমাদের নারী ও শিশুদের হত্যায় বিরত হয়।''

ওসামা বিন লাদেন এই বিবৃতিতে যা বলেছেন, তাকে তাঁর বা তাঁর সহচরদের সৎ, আন্তরিক প্রতিবেদন বলে মনে করার কোনও কারণ নেই। এটা প্রচারবার্তা, একে সে-ভাবে দেখাটাই কাণ্ডজ্ঞানের কাজ। কিন্তু উল্টো দিকের ভুলটাও যেন না হয়। এই প্রচারবার্তায় যে মানসিকতার ছবি পাওয়া যায় সেটা প্রতিশোধের, প্রতিহিংসারও; কিন্তু একই সঙ্গে সেটা অত্যাচারিতের মানসিকতা, প্রবলের আক্রমণে আক্রান্তের মানসিকতা। প্রতিশোধ এবং প্রতিহিংসার স্পৃহাও এই অত্যাচারিত এবং আক্রান্ত হওয়ার বোধ থেকেই জন্মায়। 'মার খেয়েছি, তাই পাল্টা মার দেব।' এবং বিন লাদেনের বক্তব্যের শেষ অংশটি তাৎপর্যপূর্ণ... 'যাতে ওরা নিজেদের দাওয়াইয়ের একটা স্বাদ পায় এবং আমাদের নারী ও শিশুদের হত্যায় বিরত হয়'। অর্থাৎ, আমেরিকাকে এমন মার মারতে হবে, যাতে তারা আর 'আমাদের' আক্রমণ না করে।

'আমাদের' কথাটাও লক্ষণীয়। সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ যারা চালায়, তাদের মানসিকতার সচরাচদর একটা যৌথতার ধারণা, গোষ্ঠীর ধারণা কাজ করে। সেই গোষ্ঠী বাসভূমি এবং জাতিভিত্তিতে তৈরি হতে পারে (যেমন, স্পেন বা আয়ারল্যাণ্ডের জঙ্গি আন্দোলনের ক্ষেত্রে), মতাদর্শের ভিত্তিতে তৈরি হতে পারে (যেমন, পেরুতে 'শাইনিং পাথ'), ধর্মের ভিত্তিতে তৈরি হতে পারে (যেমন, অংশত, আল কায়দার ক্ষেত্রে)। সন্ত্রাসবাদীদের কথায়, এই গোষ্ঠীসত্তার প্রবল প্রভাব বহু ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে দেখা গেছে। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল -এর সাংবাদিক ড্যানিয়েল পার্ল-এর অপহরণ ও নৃশংস হত্যায় দোষী সাব্যস্ত ওমর শেখের জবানবন্দিতে দেখি, ১৯৯২ সালে লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স -এর এই ছাত্রের মনকে প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছিল একটি চলচ্চিত্র, দ্য ডেথ অব আ নেশন। বসনিয়ার মুসলমানদের ওপর সার্বিয়ার হানাদাররা কী ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা চালিয়েছিল, তার অসহনীয় ছবি ওমর শেখকে বসনিয়ার মুসলমানদের পাশে দাঁড়াতে এবং তাদের ওপর অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে প্রেরণা দেয়। প্রথমে তিনি বসনিয়া নিয়ে যাত্রিদের এক আলোচনাসভার আয়োজন করেন, তার পরে

অনার্য সৃষ্টিসন্ধান

সেখানে ত্রাণ পাঠানোর উদ্যোগ করেন, কিছু দিনের মধ্যেই ইসলামি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। ধর্মীয় পরিচয় থেকে ধর্মাশ্রিত সত্তা—দূরত্ব অনেকের ক্ষেত্রেই সামান্য। 'আমাদের লোক' অত্যাচারিত হচ্ছে—এই চেতনা সেই সত্তায় জাতির হলে প্রতিশোধের স্পৃহা অনায়াসে সন্ত্রাসের রূপ নেয়।

সন্ত্রাসকে আগ্রাসন হিসেবে স্বীকার না করে আগ্রাসনের ন্যায়সঙ্গত প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখার এই 'যুক্তি' অবশ্যই ভয়ঙ্কর। সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ, যে আক্রমণে নিরীহ মানুষের মৃত্যু হয়, শিশুদের মৃত্যু হয়, নিরীহ মানুষ মারা যাবে জেনেও, শিশুরা মারা যাবে জেনেও যে আক্রমণ করা হয়, নিরীহ মানুষের ওপর আক্রমণ করা হবে বলেই করা হয়, তাকে অন্যায়ের জবাবে 'ন্যায্য' প্রতিক্রিয়া বলে মেনে নেওয়ার কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না, 'উচিত জবাব' -এর এই ধারণাটা কেবল অন্যায় নয়, পৈশাচিক। কিন্তু যাঁরা সেভাবে দেখছেন, তাঁদের কাছে এটা সঙ্গত এবং ন্যায়সম্মত। এই ধারণা ভয়ঙ্কর বলেই তাকে বিশেষ ভাবে বোঝা দরকার, তা নিয়ে ভাবা দরকার। যে 'যুক্তি' গ্রহণ করা যায় না, বস্তুত যা সহ্য করাই কঠিন, সেটাই আরও বেশি করে শোনা দরকার, বিচার করা দরকার, ভাবা দরকার কোথা থেকে সেই ভয়ঙ্কর অপযুক্তি আসে।

একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ব্রিটেনে পাকিস্তানের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রদূত আকবর আহমেদ ইসলাম চর্চার বিশিষ্ট পন্ডিত। তিনি 'জার্নি' ইনটু ইসলাম' (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস) নামক তাঁর বইটি একটি উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করেছেন। উদ্ধৃতিটি আইজাজ কাসমি'র। আকবর আহমেদ যখন তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন তখন আইজাজ ছিলেন দেওবন্দ - এর মাদ্রাসার উচ্চপদাধিকারী এবং মুখপাত্র।

উত্তরপ্রদেশের দেওবন্দ হল দক্ষিণ এশিয়ার মৌলবাদী ইসলাম-এর প্রধানত তাত্ত্বিক কেন্দ্র। আইজাজ কথাপ্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন, ''ওসামা বিন লাদেন, হেজবোল্লা, হামাস এবং তালিবানরা ঠিকই করেছে, যদিও তারা নারী এবং শিশুদের হত্যা করে, তবুও ইসলাম তাদের আচরণ অনুমোদন করে।'' এই মন্তব্য এবং তার অন্তর্নিহিত মানসিকতা অবশ্যই কঠোর ভাবে নিন্দনীয়। আমরা জানি, 'ইসলাম' মানে শান্তি। আমরা জানি, নারী ও শিশু হত্যায় ইসলামের অনুমোদনের তত্ত্বকে বহু তাত্ত্বিকই প্রবলভাবে নাকচ করবেন। কিন্তু এখানে সেটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হল, আইজাজ তাঁর ধারণার সপক্ষে কী যুক্তি দিয়েছেন? মনে রাখতে হবে, তিনি সন্ত্রাসবাদী নন, কট্টর মৌলবাদী, নিজের ধর্মশাস্ত্র নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা করেছেন। কোথা থেকে তিনি সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের যৌক্তিকতা পেলেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে আইজাজ জানিয়েছিলেন, মুসলমানদের ওপর মার্কিন - ইজরায়েলি (তাঁর কাছে দুটোর মধ্যে কোনো তফাত নেই, বড় জোর একটি হাইফেন আছে) আক্রমণের জবাবেই সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ। সুতরাং যাকে সন্ত্রাস বলা হচ্ছে, তা আসলে আত্মরক্ষার জন্য অত্যাচারিতের পাল্টা মার। তাঁর যুক্তি, আফগানিস্তানে, ইরাকে, প্যালেস্তাইনে মার্কিন - ইজরায়েলি বাহিনীর অন্যায় এবং বিধ্বংসী আক্রমণ বন্ধ করার জন্য আমেরিকা বা ইজরায়েলের নাগরিকরা নিজেদের রাষ্ট্রশক্তির ওপর যথাসাধ্য চাপ সৃষ্টি করছেন না, বস্তুত তাঁদের অনেকেরই এই আক্রমণে নৈতিক এবং ব্যবহারিক সমর্থন আছে, সুতরাং তাঁরাও নিরপরাধ নন। সন্দেহ নেই, এটা যুক্তি নয়, অন্যায় কুযুক্তি মাত্র। কিন্তু যে মানসিকতা এমন যুক্তির জন্ম দেয়, তাকে চিনে না নিলে প্রতিশোধস্পৃহাকে বোঝা যাবে না, তার যথার্থ মোকাবিলাও করা যাবে না। স্পষ্টতই, এই প্রতিহিংসার চরিত্র অত্যন্ত জটিল, ন্যায় - অন্যায়ের এক বিচিত্র ধারণা অত্যাচার ও বঞ্চনার এক গভীর বোধ এবং প্রতিকারের এক ভয়ানক তত্ত্ব—এই তিনের এক জটিল টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে এই প্রতিশোধস্পৃহার উদ্ভব হয়। এই জটিল প্রক্রিয়াটিকে না বুঝে 'ওরা কেন আমাদের ঘৃণা করে' বলে বিস্মিত হলে সেটা নির্বোধের বিস্ময় বই কিছু নয়।

শেষ একটা প্রশ্ন। সন্ত্রাসবাদীদের মানসিকতা বোঝা জরুরি, এই কথাটা যুক্তি দিয়ে বিচার করলে বুঝতে পারি, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সেটা কতটা সম্ভবপর? বিশেষ করে যাঁরা সন্ত্রাসের আক্রমণে বিধ্বস্ত, তাঁদের কাছে এই যুক্তির বাস্তব মূল্য কতটুকু? এই প্রশ্নের বিশদ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব না। কেবল একটি দৃষ্টান্ত দেব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট বামপন্থী সাংবাদিক ও চলচ্চিত্রনির্মাতা জন পিলজার সত্তরের দশকে একটি তথ্যচিত্র তৈরি করেছিলেন, প্যালেস্টাইন ইজ স্টিল দি ইস্যু। ২০০২ সালে সে ছবির একটি পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ নির্মাণ করেন তিনি। সেই ছবিতে একটি দৃশ্য আছে দেখা যায়, এক সন্তান হারা ইহুদি পিতা পরিচালকের সঙ্গে কথা বলছেন। ১৯৯৭ সালের ৪ সেপ্টেম্বর তাঁর চোদ্দো বছরের মেয়ে এক আত্মঘাতী ইহুদির আক্রমণে নিহত হয়। মেয়েটি তাঁর বন্ধুর সঙ্গে একটি দোকানে কেনাকাটা করছিল, সেই সময় মানববোমার বিস্ফোরণ হয়। তিন জনের মধ্যে দু'জন মারা যায়, অন্য জন ভয়াবহ ভাবে আহত হয়। কয়েক বছর আগের সেই ঘটনার কথা বলতে গিয়ে ওই মানুষটি জানিয়েছিলেন, ''আমি ক্ষমা করিনি, তার প্রশ্নও ওঠে না। ছোট্ট মেয়েদের যারা হত্যা করে তারা মারাত্মক অপরাধী, তাদের শাস্তি দেওয়া উচিত। কিন্তু কেবল হৃদয় নিয়ে না ভেবে যদি একটু মগজ দিয়ে চিন্তা করেন, যদি বোঝার চেষ্টা করেন যারা এমন নৃশংস কাজ করে, কেন করে? যে মানুষের সমস্ত আশাই হারিয়ে গিয়েছে, যারা এতটাই মরিয়া যে আত্মহননে প্রবৃত্ত হয়, তাদের দিকে তাকালে নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে, এই ভয়াবহ হতাশার পিছনে আপনার কি কোনও ভূমিকা আছে? এ জিনিস আকাশ থেকে পড়েনি। যে (প্যালেস্তানীয়) কিশোরের মা সকালে (ইজরায়েলি সেনার দ্বারা) লাঞ্ছিত হয়েছেন, সে-ই তো সন্ধ্যাবেলায় মানববোমা হয়ে ফাটবে।''

এর পরে ওই কন্যাহারা পিতা এক আশ্চর্য ব্যক্য উচ্চারণ করেন। তিনি বলেন, ''ওই আত্মঘাতী মানববোমা নিজেই এক শিকার—ওই মেয়েটির মতোই। এই বিষয়ে আমার কোন সংশয় নেই।'' তাঁর পরামর্শ ''এই আত্মঘাতী মানুষগুলো কোথা থেকে উঠে আসে, কী ভাবে তৈরি হয়, সেটা বুঝতে হবে, এই সংকটের মোকাবিলা করতে চাইলে সেটা জরুরি, বোঝাটা সমস্যা সমাধানেরই একটা অঙ্গ।'' যে পিতা সন্ত্রাসবাদীর আক্রমণে নিজের কিশোরী কন্যাকে হারিয়েছেন তিনি যদি এমন কথা বলতে পারেন, তা হলে আমরা সন্ত্রাসের জবাবে 'মেরে দাও, গুঁড়িয়ে দাও' মার্ক পাল্টা সন্ত্রাসের পক্ষে সওয়াল করব কেন? কেন ধরে নেব যে, সন্ত্রাসের অন্য রকম জবাবের কথা ভাবা সম্ভব নয়?

ঋণঃ লেখাটি বহুলাংশে লিজ রিচার্ডসন -এর 'হোয়াট টেররিস্টস ওয়ান্ট' (র‍্যাণ্ডম হাউস, ২০০৬) বইটি পড়ার অভিজ্ঞতা প্রসূত। বইয়ের সাবটাইটলটি তাৎপর্যপূর্ণ, আণ্ডারস্টান্ডিং দি এনিমি, কনটেনিং দ্য থ্রেট। সন্ত্রাসবাদ এবং সন্ত্রাসবাদীরা অবশ্যই আমাদের শত্রু, কিন্তু শত্রুকে দমন করার জন্য তাকে বোঝা জরুরি। এবং জর্জ বুশরা জানেন না বা মানেন না যে শত্রুকে নির্মূল (এলিমিনেট) করার অবাস্তব চিন্তার চেয়ে শত্রুকে নিয়ন্ত্রণে রাখার (কনটেন) চেষ্টা অনেক বেশি বিচক্ষণতার পরিচায়ক। লিজ খুব দরকারি কিছু কথা বলেছেন এবং বলেছেন তাঁর দীর্ঘ গবেষণা, মনোযোগী পর্যবেক্ষণ এবং দুর্মর শুভচেতনার ভিত্তিতে। এই লেখা লিজ রিচার্ডসন -এর কাছে ঋণী বললে খুব কম বলা হবে।